'সমাজবাদী' জয়প্রকাশের নূতন রূপ

সমাজবাদ কায়েমের জন্য জয়প্রকাশীদের ভোট দিতে

৬

এবং

নিজেদের বদ অভ্যাস দূর করিতে চাষীদের উপদেশ

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক সুবোধ ব্যানার্জ্জী

সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বাংলা মুখপত্র (পাক্ষিক)

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | বুধবার ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৯, ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৬ | মূল্য—দুই আনা

(নিজস্ব সংবাদদাতার পত্র)

সোস্যালিষ্ট পার্টি ও হিন্দ-কিষাণ পঞ্চায়েতের বিহার শাখা গত ২৫শে নভেম্বর পাটনাতে এক কিষাণ সমাবেশ আর সভার ব্যবস্থা করে। বিহার কংগ্রেসী সরকারের জমিদারী প্রথা সম্বন্ধীয় সর্বশেষ আইনের প্রতিবাদ হিসাবে এই সভা ও সমাবেশের আয়োজন হয়।

সোস্যালিষ্ট পার্টি অগাধ টাকা খরচ করিয়া এবং খবরের কাগজের প্রচার হইতে শুরু করিয়া, পোষ্টার ইস্তাহার প্রভৃতি প্রচুর ছড়াইয়া ঘোষণা করে যে ২৫শে নভেম্বর তারিখে সারা বিহারের বিভিন্ন জেলা হইতে কিষাণরা দলে দলে পাটনা সহরে সম্মিলিত হইবে এবং নিজেদের দাবীর সমর্থনে আওয়াজ উঠাইবে। চম্পারণ, দারভাঙ্গা প্রভৃতি কয়েকটি জেলার কিষাণদের নিকট তাহারা প্রচার করে যে, যদি কিষাণরা জমিদারী প্রথার অবিলম্বে অবসান চায়, জমি হইতে অন্যায় উৎখাত বন্ধ করিতে চায়, ক্ষেত-মজুর ও ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে জমি ভাগ করিয়া লইতে চায় তাহা হইলে যেন সমস্ত কিষাণরা ২৫শে তারিখে পাটনায় আসে ; সেইখানে জয়প্রকাশবাবু তাহাদের জমি দিবে ও জমিদারের অত্যাচার বন্ধ করিবে। ঐ দিন তাহারা কিষাণদিগকে নিজ নিজ গ্রাম হইতে পাটনায় মার্চ করিয়া আসিতে বলে। জিপ, মোটর, পোষ্টার, ইস্তাহার, টাকার ছড়াছড়িতে প্রচার জমিয়া উঠে, কৃষকদের ধাপ্পা দেওয়াও চলে সমান তালে।

তাহাদের এই মুখরোচক প্রচারের ফাঁদে বেশ কিছু চাষী বাঁধা পড়ে ; তাহারা ভাবে যদি একবার পাটনায় যাইলেই জমি পাওয়া যায়, জমিদারের অত্যাচার বন্ধ হয়, তাহা হইলে যাইতে আপত্তি কি। ফলে এত প্রচারের পর ২৫শে তারিখে দেখা যায় লাখ লাখ কিষাণের "ঐতিহাসিক মার্চ" (তাহাদের কথায়) এর পরিবর্তে তিন চার হাজার কৃষক, মধ্যবিত্ত ও ছাত্রদের সমাবেশ পাটনার গান্ধী ময়দানে। সোস্যালিষ্ট পার্টির বিহার প্রাদেশিক নেতারা এই 'মার্চকে' চীনের বিখ্যাত Long route march, জয়প্রকাশকে লেনিন এবং তাঁর বাণীকে রাষ্ট্রযন্ত্র অধিকারের পর লেনিনের কৃষকদের নিকট ঘোষণার সহিত তুলনা করে।

যে কৃষকরা জমি পাইবার আশায় পাটনায় উপস্থিত হয়, তাহাদের লইয়া সারা সহর প্রদক্ষিণ করা হয়, মুহুর্মুহুঃ শ্লোগান উঠে "ভারতের লেনিন—জয়প্রকাশ জিন্দাবাদ।" অবশেষে কংগ্রেসী কায়দায় ইলেকট্রিক আলোকমালায় সজ্জিত সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয় এই মিছিলটি। তারপর বক্তার পর বক্তা ইনাইয়া বিনাইয়া বক্তৃতার ঝড় উড়ান।

লক্ষ্য করিবার বিষয় বিহার সরকারের '৪৯ সালের নূতন 'বিহার মেনটেনেন্স অফ্ পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স' অনুযায়ী কোথাও সভা, সমাবেশ, মিছিল প্রভৃতি করিতে হইলে সরকারের অনুমতির দরকার হয় এবং কোন প্রকৃত বামপন্থী দলই সে অনুমতি পর্যন্ত পায় না। (মৌভাণ্ডারে সোস্যালিষ্ট ইউনিট সেণ্টারের রাজনৈতিক সম্মেলনের অনুমতি পাওয়া যায় নাই ; ঝরিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের নামে মামলা চলিতেছে) অথচ 'ভারতের লেনিন—জয়প্রকাশ'কে সভা করিতে দিতে কংগ্রেসী সরকার শুধু রাজী হইল তাহাই নয় বিহারের অন্যতম মন্ত্রী জগতলাল চৌধুরী স্বয়ং সভামঞ্চে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকিয়া কংগ্রেসী প্রভুদের সমর্থন জানাইতে কার্পণ্য করেন নাই।

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

অহিংস কংগ্রেসী সরকারের অহিংস নীতির দাপট

★ ১১ বৎসর বয়স্ক বালকের ৪৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

★ ৪০ জন কৃষক নেতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

★ ৩০ জনের প্রাণদণ্ড

গান্ধিজীর শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের দ্বারা পরিচালিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির কোনটিও একদিনের জন্য অহিংসার প্রশস্তি গাহিতে পিছায় নাই, অথচ প্রতিদিনের কাজে জনতার উপর লাঠি, গ্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া গুলি-গোলা চালাইতে তাহাদের অত্যুগ্র উৎসাহের প্রমাণ মিলে। এইখানেই গান্ধীয় নীতির অন্তর্নিহিত নিজস্ব বিরোধ—মুখে বড় বড় ধর্ম্মের কথা আর বাস্তবে পশুর মত হিংস্র ব্যবহার।

বক্তৃতামঞ্চে বুদ্ধের অহিংস বাণীর তুবড়ী উড়াইয়া পরমুহূর্ত্তে নিরীহ নিরস্ত্র বাস্তুহারাদের উপর গুলি চালাইতে বাধে নাই পশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী সরকারের, অহিংসানীতির সমর্থক এই অজুহাতে পণ্ডিত নেহেরু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহিদ ক্ষুদিরামের প্রস্তরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহার একটুকুও আপত্তি দেখা যায় নাই মার্কিণ মুলুকে সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনীর স্মৃতি স্তম্ভের পাদদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করিতে, ভারতবর্ষকে ইঙ্গ-মার্কিণ যুদ্ধ শিবি[illegible] দিতে ; [illegible]

যাঁহারা গো-সেবার উপদেশ দেন তাঁহাদের আদেশে শত শত শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, স্ত্রী, পুরুষ, বালককে কুকুর বিড়ালের মত গুলি করিয়া নিহত করা হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, অহিংস কংগ্রেসী রাজত্বে ফাঁসির রেওয়াজ বাড়িয়া গিয়াছে। কথা ও কাজের মধ্যে এই অসামঞ্জস্যের কারণ—বড় কথা ইহাদের জনতাকে ধাপ্পা দিবার কৌশল।

এই অত্যাচারের মাত্রা যে ভাবে চলিতেছে তাহা কোন সভ্যদেশে চলিতে পারে বলিয়া ধারণা করা যায় না। হায়দারাবাদে যে নিজামের আজ্ঞায় শত সহস্র ভারতবাসীকে ঘর জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের স্ত্রীকন্যার উপর পাশবিক অত্যাচার, যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা এমন কি প্রাণে মারা হইয়াছে সেই নিজাম আজও বহাল তবিয়তে নিজামী চালাইতেছেন। যে কাশিম রেজভী নিজ হাতে এই সমস্ত অপকর্ম্ম করিয়াছে তাহাকে কঠোর শাস্তির বদলে দীর্ঘ দিন সময় লইয়া জনবিরূপতা হইতে রক্ষা করার চেষ্টা চলিতেছে, অথচ অসংখ্য সাধারণ কৃষকের উপর উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সম্প্রতি এই অত্যাচার আরও

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

গণতন্ত্রের ধোঁকা

ভারতীয় গণপরিষদে মহা-আড়ম্বরে ভারতের গঠনতন্ত্র গৃহীত হল আর নেতারা তাই ঢাক পিটিয়ে, গলাবাজি করে জনসাধারণের কাছে প্রচার করে বলছেন যে, ভারত এবার গণতন্ত্রী রাষ্ট্র হয়ে উঠবে, জনসাধারণ এবার দেশের কর্ত্তৃত্ব নেবে। কিন্তু গত তিন বছরে যে নেতারা জনসাধারণের অভাব-অভিযোগের একটিও মেটাতে পারেননি উপরন্তু নতুন নতুন পথে তাদের শোষণ করে চলেছেন, সেই নেতাদের এই মৌখিক ভাগে কথাটাকে আজ চুল চেরা বিচার করতে হবে। কাজেই এই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রটা বিচার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে রাষ্ট্র কি আর গণতন্ত্র কার।

রাষ্ট্র হচ্ছে এক শ্রেণীর দ্বারা অন্য শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার যন্ত্রমাত্র। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থা যখন আস্তে আস্তে সমাজের মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোকের হাতে এসে পড়ল, আর তারা এই উৎপাদন ব্যবস্থার মারফৎ সমাজের সাধারণ মানুষকে শোষণ করে নিজেরা ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগল, তখনই সমাজে দেখা গেল একটা বৈষম্য। আর এই বৈষম্যের ফলে সমাজের মানুষ বিরাটভাবে শোষক আর শোষিতে ভাগ হয়ে গেল এবং তাদের পরস্পরের সংঘাত সুরু হল। কাজেই উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকদের একজোট হতে হল এই শোষিতের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে— শোষণটাকে ভালোভাবে চালিয়ে যাবার জন্যে। এই কাজে তাদের দরকার হল এমন একটা শক্তির যে শক্তি সমাজের ওপরে থেকে সমাজের কর্ত্তৃত্ব করবে। এই শক্তিই হল রাষ্ট্র। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে রাষ্ট্র সমাজের বাইরে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে সমাজ শাসন করবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, একটা বিশেষ শ্রেণী তার নিজের প্রয়োজনে রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরী করল এবং তার কাঠামো ও আইন কানুন তৈরী করল তার সুবিধে অনুসারে। অর্থাৎ যে শ্রেণী যখন রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে তখন তার গঠনতন্ত্রে সেই শ্রেণীর অবাধ স্বাধীনতাই থাকে। দেশের সমস্ত জনতার স্বাধীনতা থাকে না, বরং জনতাকে শোষণ করার জন্যই সেই গঠনতন্ত্র তৈরী হয়।

গত ১৫ই আগষ্টের পর ভারতীয় পুঁজিবাদী শ্রেণী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাথে রফা করে ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করল শান্তিপূর্ণ উপায়ে। আজ ইংরেজের তাহাদের সৃষ্টি, নিজেরা চেষ্টা করিলে শ্রেণী। তাদের হাতেই আজ সমস্ত বড় বড় শিল্প, কলকারখানা, খনি, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স সমস্ত কিছু। কাজেই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে তারা এমন একটা গঠনতন্ত্র তৈরী করতে চাইবে যাতে তাদের কর্ত্তৃত্ব সম্পূর্ণ বজায় থাকে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। তাই গণপরিষদে যে গঠনতন্ত্র তৈরী হল, তা হচ্ছে এ দেশের পুঁজিবাদী শ্রেণীর অবাধ শোষণের অধিকার। অর্থাৎ মেহনতকারী জনতাকে আইনতঃ শোষণ করবার ভার তাদের হাতে দেওয়া হল। আর অপরদিকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা হল দেশের অগনিত মেহনতি মানুষকে, ভুখা কিষাণ মজুরকে, আধমরা মধ্যবিত্তকে। তাই দেখা যাচ্ছে, ঐ গঠন তন্ত্রে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে, বড় বড় শিল্পকে জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল না—রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন অধিকারই রইল না। কি করেই বা থাকবে? যে শাসনতন্ত্রে জনসার্থের অনুপ্রেরণা নেই, বরং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শাসনতন্ত্রের কায়দায় যাকে গড়ে তোলা হয়েছে তার কাছ থেকে জনসাধারণকে পিষে মারার কৌশল ছাড়া আর কিছু আশা করা অবৈজ্ঞানিক। এ শাসনতন্ত্রে আমেরিকার আদর্শে প্রেসিডেণ্ট পদের সৃষ্টি করা হল। তার হাতে শাসনের সমস্ত ক্ষমতাটা কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হল। শুধু তাই নয়, প্রদেশগুলির ক্ষমতাও কেড়ে নিয়ে একমাত্র প্রেসিডেণ্টের হাতে তুলে দেওয়া হল। তাই কোনদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার কোন নির্দ্দেশ পালনে কোন প্রাদেশিক সরকার যদি অসমর্থ হয়, অথবা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সঙ্গে কোন প্রাদেশিক সরকারের মতভেদ যদি ঘটে, তবে সেই মুহূর্ত্তে প্রেসিডেণ্ট এদের গণতান্ত্রিক (?) উপায়ে ঘোষণা করতে পারবেন যে সে প্রদেশের শাসনকার্য্য বানচাল হয়ে গেল। Right of self determenation এর সমাধি হল। এই গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে বিনা বিচারে আটক করা বৈধ করা হয়েছে। উপযুক্ত শ্রমের বিনিময়ে জনসাধারণের জীবিকা ও আশ্রয়ের দাবীকেও স্বীকার করা হল না স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে। যে কোন গণতন্ত্রের গোড়ার কথা—মানুষের এই মৌলিক অধিকারটুকুও ভারতীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত হল না। কাজেই এই শাসনতন্ত্রকে এমনকি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রও বলা যায় না। এ হচ্ছে ফ্যাসিবাদের নগ্ন রূপ। ১৫ই আগষ্ট

॥ —— ৩য় পাতায়)

মধু ও হুল

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই— এই কথাটাই এতদিন চলে আসছিল। এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা সব সময়ে ঠিক নয়। চুরির মাল ভাগাভাগিতে যদি গোলমাল বাধে তাহলে চোরেরা আর আগের মাসতুতো সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা; আরও নিকট ও অনেক বেশী মধুর সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে। এর প্রমাণ মিলবে কংগ্রেসী কর্ত্তাদের ব্যবহার থেকে। পশ্চিম বাংলা কংগ্রেসের অধঃপতন যে কতদূর হয়েছে তা বলতে গিয়ে বর্ত্তমান কংগ্রেস কমিটি বিরোধী সরকারপক্ষীয় জনৈক কংগ্রেস নেতা বলেছেন— "২৪ পরগণা এড হক কংগ্রেসের দুজন সদস্য চোরাকারবারী।" হা রাম! মোটে দুজন? আমরা ত লোকমুখে শুনি সব কজনই। আর এ বা এমন নতুন কি? এর আগে নেতাটির উপদলের হাতে যখন কংগ্রেস ছিল তখনও ২৪ পরগণা জেলা কমিটিতে এমন একজন প্রধান ছিলেন যিনি গত যুদ্ধের সময়ে ইংরেজ প্রভু ও লীগকর্ত্তাদের পদাম্বুজে ভালভাবে তৈল প্রদান করে কেরোসিন তেল ও কাপড়ের পারমিট নিয়ে কালবাজারী চালিয়েছিলেন। তবে তিনি গভীর জলে বিচরণ করেন বলে কারবারটি দাদার নামে চালিয়েছিলেন নিজের নামের বদলে। তারপর পঞ্চাশের মন্বন্তর এল— সঙ্গে সঙ্গে বাবার বেনামে চলল চালের কালোবাজারী। স্বাধীনতার লড়াইএর সৈনিকের এইখানেই থামলে চলে না; তাই স্বাধীনতার অরুণোদয়ে দেশ যখন প্লাবিত হল, পুরাণ দাদারা মন্ত্রীত্বের গদীতে উঠলেন তখন বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী রাজনৈতিক দাদাকে ধরে কয়েক শ গাঁট কাপড়ের পারমিট তিনি নিলেন দেশের লোকের বস্ত্রাভাব ঘোচাবার সাধু উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাম হনুমানের রাজত্বে কাপড় পরলে যে হনুমানীয় আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হতে হয় তাই সেই কয়েক শ গাঁট বড়বাজারের গুদামে নিশ্চিন্তে স্থান লাভ করল আর তার বিনিময়ে কংগ্রেসী নেতাটি পেলেন কয়েক সহস্র মুদ্রা। তবুও একে আপনারা কালোবাজারী বলতে পারেন না কারণ টাকাটা তিনি নিজে নিলেও গো সেবার নাম করে নিয়েছিলেন। দক্ষ গান্ধী মার্কা সততা। যদি বাঁচতে চান তাহলে, এখনই গলাছেড়ে ধরুণ—জয়, জয় রঘুপতি রাঘব—গানটা।

* * *

সরকার পক্ষীয় কংগ্রেস নেতাটির কথায় একটা ঘটনার কথা মনে পড়ল। ভোদো বলে একজন নামকরা চোর ছিল যাকে বলে একেবারে Jailbird, জেলের ঘুঘু। জীবনে সে বোধ হয় বার তিরিশেক সরকারের অতিথি হয়েছে। একদিন দেখি রাস্তায় একটা লোককে সে বিষম ঠ্যাঙাচ্ছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাস করলে সে বলে—"বাবু। ব্যাটা পকেটমার।" বার তিরিশেক জেল ফেরত ভোদো পকেটমার বলে ঠ্যাঙাচ্ছে—ব্যাপারটা অদ্ভুতই ঠেকল। পরে অবশ্য আসল কারণটা জানা গেল—চুরি যদি করতেই হয় তো ছিঁচকেপনা কেন? এখানেও তাই। যেখানে বিহারে গুড়ের ব্যাপারে লাখ লাখ টাকা ওড়ে, যুক্ত প্রদেশে ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দিতে সাহায্য করায় দামী মোটর গাড়ী মেলে, মাদ্রাজের কেচ্ছা ঢাকতে অখিলভারত কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদককে ছুটতে হয়, দিল্লীর কনসটিটিউয়েণ্ট এসেম্বলীর সভ্যদের পেট্রোলে কালোবাজারী চুণকাম করতে পণ্ডিতজী হন্তদন্ত হয়ে পড়েন, বোন, ভাগ্নি জামাই, ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়ে কিংবা এই দেশেই রেখে কোটী টাকা কামিয়ে নিতে সাহায্য করা হয়, সেখানে ছিঁচকেপনা করলে যে জাত যাবে বিশেষ করে নেতাদের। ছিঁচকে চুরি সাধারণ কংগ্রেস সভ্যরা করলে বলার কিছু নেই। তা বলে নেতারা চুনোপুঁটি মারবে? রুই কাতলা কাদের ভাগে যাবে? সত্যিইত; এরচেয়ে হক কথা আর কি হতে পারে? এরপর দুই পক্ষীয় কংগ্রেসী নেতাদের আবার মাসতুতো ভাই হয়ে কংগ্রেসের দুর্নীতি-স্বজন পোষণ-কালোবাজার-বিরোধী ঐক্য-ফ্রণ্টে যোগ দিতে আপত্তি হবে না নিশ্চয়।

* * *

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি জোচ্চোর কারখানায় পরিণত হল? এতদিন শোনা যাচ্ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি কর্মকর্ত্তাদের ঘিরেই আছে—ভাইসচ্যান্সেলার, রেজিষ্ট্রার ও কনট্রোলার অফ একজামিনেসনস্ বিভাগে তার প্রচলন। এখন দেখা যাচ্ছে তা নয়, সর্বত্রই গলদ— স্বনামধন্য অধ্যাপকরাও বাদ যান না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন জনৈক অধ্যাপক এতদিন তাঁর বাড়ীর চাকর, ড্রাইভার, দারোয়ান, মালীর কাজটা

(শেষাংশ ৪র্থ পাতায়)

সোভিয়েট ইউনিয়নের আজন্ম শান্তিরক্ষার সংগ্রাম

[পুঁজিবাদ ও যুদ্ধ অবিচ্ছেদ্য। পৃথিবীতে যতদিন ধনতন্ত্র বেঁচে থাকবে ততদিন ধনিক শ্রেণী নিজের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটার পর একটা যুদ্ধ বাধাবেই বাধাবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সংকট যখন মারাত্মকভাবে দেখা দেয়, সাধারণপুঁজিবাদী উপায়ে তাকে রোধ করার উপায় যখন থাকে না তখন পুঁজিপতিদের মুনাফা রক্ষা আর কয়েক বছরের জন্য সংকট কাটাবার উদ্দেশ্যে ধনিক রাষ্ট্র জনতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জনতার ঘাড়ে লড়াই চাপিয়ে দেয়। এমনি করেই এই জঘন্য যুদ্ধচক্র চলে আসছে। সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধা মেটাবার জন্যই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, সাম্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করে পুঁজিবাদ ফ্যাসিবাদকে কায়েম করার উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বর্ত্তমান বিশ্ব শ্রেণীশক্তির সমাবেশে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদীরা নিজেদের মধ্যে আর একটি যুদ্ধ বাধাবে— এ চিন্তা ভুল। এখন পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদী শিবিরের একমাত্র চেষ্টা হল তাদের সমগ্র শক্তি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তাই তারা পৃথিবীর প্রতিটি কোণে গড়ে চলেছে সামরিক ঘাঁটী, একের পর এক রচিত হচ্ছে সামরিক চুক্তি বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়ে এমন কি এতদিনের অপাঙক্তেয় জেনারেল ফ্রাঙ্কোরও ডাক পড়েছে এই সাম্যবাদবিরোধী লড়াইএর আসরে। প্রতিক্রিয়াশীলদের যুদ্ধ বাধাবার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে না পারলে জনতার চূড়ান্ত দুর্দিন নেমে আসবে। আর তা করার একমাত্র পথ হল, পুঁজিবাদ বিরোধী শান্তি-শিবির, সোভিয়েট শিবিরকে শক্তিশালী করা, নিজের দেশের পুঁজিবাদ বিরোধী যুদ্ধ বিরোধীদের সংগ্রামী মোর্চায় ঐক্যবদ্ধ করে।— **সম্পাদক, গণদাবী।**]

জীবনের সজীবতায়, বাস্তবক্ষেত্রে, মানুষের বিবেকের রাজ্যে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন এবং শান্তি এই দুটি কথা এক হয়ে গিয়েছে। মানুষের ইতিহাসে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কণ্ঠে শান্তির বাণী নিয়ে। প্রথম দিনটি থেকেই সে সাম্রাজ্যবাদ এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার মতকে স্পষ্ট ভাষায় জানাতে দ্বিধা করেনি।

১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর স্মলনির জনপূর্ণ হলে লেনিনের অমর কণ্ঠে উচ্চারিত হোল একবাণী প্রত্যেকটি যুদ্ধরত দেশ এবং সরকারগুলোর উদ্দেশে। সে বাণীতে (Decree) লেনিন তাদের ন্যায্য ও গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা চালাতে ডাক দিলেন। তারপর আজ ৩২ বছর কেটে গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের মোসায়েবেরা ক্ষ্যাপার মত গলাবাজি করেছে, সমর দানবেরা বিশ্বাসঘাতকের মত আক্রমণ করেছে কিন্তু সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি একটি দিনের তরেও শান্তি সংগ্রামের পতাকাকে নামায়নি।

লেনিন ও স্তালিন বরাবর শ্রমজীবিদের বলে এসেছেন যে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণাত্মক যুদ্ধে একমাত্র ধনিক শোষিত শ্রমজীবিদেরই ক্ষতি। এই সব যুদ্ধে ধনপতিরা মুনাফায় ফেঁপে ওঠে; যুদ্ধে তাদের জীবন বিপন্ন হয় না। কষ্ট পায়, যুদ্ধে প্রাণ দেয় শ্রমিকেরা, যুদ্ধের সময় প্রতিক্রিয়ার ঘানি তাদের আরো বেশী কষ্ট দেয়। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ তা তারা যেখানেই থাকুক না ভাষা তাদের যাই হোক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনো চাইতে পারে না। সমাজতন্ত্রী সোভিয়েৎ ইউনিয়ন তার শান্তিসংগ্রামে এই শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করছে।

ধনতন্ত্র ও যুদ্ধ অবিচ্ছেদ্য

লেনিন ও স্তালিনের শান্তির বাণী প্রধানতঃ এই সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে বলা সেইজন্যই তো সাম্রাজ্যবাদীদের এত আক্রোশ। লেনিন স্তালিনের শান্তিবাণী পড়ে তখনকার মার্কিণ পররাষ্ট্রসচীব ল্যানসিং রাষ্ট্রপতি উইলসনকে লিখে জানালেন যে **এই বাণী সমস্ত দেশে চালু সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে প্রত্যক্ষ বিপদ ডেকে এনেছে।** একটি গোপন টেলিগ্রামে মার্কিণ ধনিক শ্রেণীর এই দালালটি ধনতন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক স্বীকার করতে দ্বিধা করেননি।

সাম্রাজ্যবাদী সমর দানবেরা জানে খোলাখুলিভাবে যুদ্ধের উদ্যোগ করা সোজা নয়। তাই শান্তির বুলির আড়ালে চালায় তাহারা যুদ্ধের উদ্যোগ। এই বঞ্চনা বহুদিন আগে চালানো অনেক সোজা ছিল। কিন্তু ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বরের পরে স্তালিনীয় পররাষ্ট্রনীতির কল্যাণে এই জুয়াচুরির মুখোস খুলে গিয়েছে। এইখানেই হোল স্তালিনীয় পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দান। ৩২ বছর ধরে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যেকটি ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে বিশ্ববাসীকে আসল কথা জানিয়ে দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা কতই না চেষ্টা করেছে লোকার্ণো চুক্তিকে “শান্তিকামী” প্রমাণ করার। স্তালিনের মারফৎ সোভিয়েৎ ইউনিয়ন লোকার্ণোচুক্তিকে নূতন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বাধান অস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছে। “যুদ্ধকে বেআইনী করার জন্য” কুখ্যাত কেলগ চুক্তি নিয়ে কতই না চোখের জল ফেলা হয়েছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন দেখিয়ে দিয়েছে যে এই চুক্তি-কর্ত্তারা যুদ্ধের পথ ত্যাগ করার কথা ভাবেননি, তাঁদের মতলব ছিল কি করে যুদ্ধের উদ্যোগকে লোকচক্ষু থেকে লুকিয়ে রাখবেন কথার তুবড়ীবাজি দিয়ে। কুখ্যাত চেম্বারলেন এবং দালাদিয়ের মিউনিক পর্য্যন্ত "শান্তির জলপাইশাখা" আস্ফালন করতে লজ্জা পাননি। স্তালিনই প্রকাশ করে দিয়েছিলেন মিউনিকের আসল কথা।

আজকের দিনেও আমেরিকার এটম ধুরন্ধরেরা বীভৎস অতলান্তিক চুক্তির ওপর শান্তির বার্ণিশ লাগাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ট্রুম্যান আর আচিসনের এই অপচেষ্টায় কোন ফল হয়নি। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন তাদের মুখোস ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে; সোভিয়েৎ দেখিয়ে দিয়েছে যে এই চুক্তি পৃথিবীতে মার্কিণ ধনিকশ্রেণীর আধিপত্য বিস্তারের জন্য এক নতুন যুদ্ধ বাধাতে চায় এবং বিশ্বসভাকে পঙ্গু করতে চায়। এইভাবে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন ইঙ্গ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী শয়তানদের এটম কূটনীতির নরককুণ্ডে যে মারাত্মক বিষ তৈরী হচ্ছে তার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সময় থাকতে সাবধান করে দিয়েছে।

সোভিয়েৎ ইউনিয়নের পররাষ্ট্রনীতি ৩২ বছরের মধ্যে কোনদিন পথভ্রষ্ট হয়নি। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন কোনদিন সোজাসুজি সমরদানবের নাম করতে ভয় পায়নি। ট্রুম্যান, আচিসন, ডালেস্, চার্চিল, মার্কিণ ধনপতি শ্রেণী এবং তাদের ভাড়াটে টিটো ব্যাংশেভিক, রায়েক কাউকে সোভিয়েৎ ছেড়ে কথা বলেনি। নতুন যুদ্ধের আগুণ জ্বালাবার জন্য যারা তৈরী হয়ে আছে তাদের ঠিকানা দিতেও সোভিয়েৎ দ্বিধা করেনি। সে ঠিকানা হল ওয়াশিংটন, লণ্ডন, বেলগ্রেদ।

সোভিয়েৎ ইউনিয়ন দাবী করেছে গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি যে সব দেশে ইঙ্গ মার্কিণদের রক্তাক্ত হস্তক্ষেপ চলেছে তা বন্ধ করা হোক। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন বিশ্বসভাকে শান্তিরক্ষী হিসাবে শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।

শান্তির সহায়ক প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে সোভিয়েৎ সমর্থন করে। ওয়ালেসের এবং কিংসবেরী স্মিথের প্রশ্নের জবাবে স্তালিনের উক্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন শান্তির স্বার্থে কিছু কিছু কন্‌সেশন দিতেও রাজী হয়েছে। বার্লিন সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েতের মনোভাবই এ কথা প্রমাণ করেছিল পররাষ্ট্রসচিব বৈঠকে।

সোভিয়েৎ ইউনিয়নের শান্তিপ্রিয়তার আর একটি নতুন প্রমাণ বিশ্বসভার বর্ত্তমান অধিবেশনে পাওয়া গিয়েছে। সোভিয়েৎ প্রতিনিধি ভিশিনস্কী প্রস্তাব করেছেন যে ব্রিটেন আমেরিকা ইত্যাদি দেশে যে যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে তার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে হবে। এটম অস্ত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও সোভিয়েৎ এটম বোমা নিষিদ্ধ করার এবং নিষেধ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করেছে। শেষে বৃহৎ পঞ্চশক্তির মধ্যে শান্তিচুক্তি করার প্রস্তাব করেছেন সোভিয়েৎ প্রতিনিধি। সোভিয়েৎ প্রস্তাব বিশ্বের সাধারণ মানুষের বাসনাকে রূপ দিয়েছে। সোভিয়েৎ ইউনিয়ন শান্তির ফাঁকা বুলি কপচায় না। সোভিয়েৎ প্রস্তাব অনায়াসে কাজে পরিণত করা যায়।

লেখক—এন, রুবিনস্তাইন

গত ৩২ বছরের ইতিহাসে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ এই শিক্ষা পেয়েছে যে একমাত্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নই শান্তির নিশান ধরে রয়েছে। স্তালিন লিখেছেন :—“পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ মস্কোর দিকে তাকিয়ে আছে। অগাধ আশা নিয়ে, তারা জানে মস্কো এক বিশাল শক্তিশালী শান্তিকামী রাষ্ট্রের রাজধানী এবং শান্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ।”

সেই আশায় ভর করে দিনে দিনে অপ্রতিহতভাবে শান্তি সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠছে। পৃথিবীর বিভিন্ন শান্তি সম্মেলনে বক্তৃতাগুলিতে এই আশাই রূপ পেয়েছে প্রাগের শান্তি সম্মেলনে চেক সাহিত্যিক জান দ্রদা বলেছিলেন :—“শান্তি রক্ষার জন্য সোবিয়েতে প্রচণ্ড প্রয়াসের সাড়া পাওয়াগিয়াছে পৃথিবীর সমস্ত দিক থেকে। দূরত্ব বা মিথ্যা প্রচারের চাপে শান্তি-

(শেষাংশ ৫ম পাতায়)

গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা

(২য় পাতার পর)

ভারতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে আর এই শাসনতন্ত্রের পাচে তাকে আইনত করা হল। যে কংগ্রেস আজ শাসনতন্ত্রের ভার নিয়েছে তার প্রতিনিধিরা যে এর প্রশংসা করবে এবং এর সমালোচনা করলেও সেটা যে খুব মৃদু হবে এবং আসল রূপ দেখাবে না—সেটাই সত্য। তবু এই শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে এঁদের মুখেও শোনা যাচ্ছে যে এই শাসনতন্ত্রে গণতন্ত্রের গলা টিপে মেরে ফ্যাসিবাদ কায়েম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস সেক্রেটারী শঙ্কররাও দেও বলেছেন, 'জার্মানীর ওয়েমার শাসনতন্ত্রের অনুকরণে আমাদের প্রেসিডেণ্টের হাতে যে বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁকে পুরাত প্রস্তাবে ডিক্টেটর করে তুলবে।' পঃ বঙ্গ কংগ্রেসের সহসভাপতি অরুণ গুহ বলেছেন, 'প্রেসিডেণ্টের হাতে এত বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে, তা অনেকটা হিটলারের আবির্ভাবের আগে রাইখের প্রেসিডেণ্টের হাতে ন্যস্ত ক্ষমতার অনুরূপ।'

বিহারের বাবু রামনারায়ন সিং বলেছেন, 'উত্তরপুরুষদের পক্ষে এই শাসনতন্ত্রটি দিল্লী কিংবা লণ্ডনে তৈরী হয়েছিল, তা বোঝা সম্ভব হবে না।' ত্রিবাঙ্কুরের চাকো বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট ও তার কার্য্যনির্ব্বাহকগণের অসাধারণ ক্ষমতার প্রত্যক্ষ নীতি জার্ম্মাণ শাসনতন্ত্রের সামিল, যার ফলে হিটলারের আবির্ভাব হয়েছিল।'

কাজেই, এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর ফ্যাসিবাদী সরকার সাধারণ নির্ব্বাচনের দ্বারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বললে, তা ধোঁকা দেওয়া হবে, মেহেনতী মানুষের সাথে জুয়োচুরি করা হবে, দেশভরা উপোসী মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে এবং তাই হয়েছেও। পরিষদে জনসাধারণ যদি দু-চারটে প্রতিনিধি পাঠায়ও তবু জনসাধারণের লাভ তাতে এতটুকু নেই। সেই প্রতিনিধিরা বড়-জোর সরকারী ফ্যাসিবাদী কাজের প্রতিবাদ করে গলা চিরে ফেলতে পারে—ঐ পর্য্যন্তই এঁদের দৌড়, তার বেশী আর কিছু করিতে তাঁরা পারেন না। আর যে প্রতিবাদ খুব বেশী দূরও এগোতেও পারবে না। তা হলেই শাসনতন্ত্রের আইনে তা বে-আইনী হবে।

তাহলে এখন উপায়? জনসাধারণ কি হবে চিরকাল এদের দয়ার জন্যে হা-পিত্যেশ করবে? আজ জনসাধারণকে যদি খেয়ে পরে বাঁচতে হয়, মেহেনতকারী মানুষকে যদি আজ বাঁচতে হয়, কিষাণ মজদুর ভায়েরা যদি আজ পেটভরে খেতে চায়, প্রাণভরে শান্তি চায়, ত' তাদেরও নিজেদের রাষ্ট্র গড়তে হবে। নিজেদের গঠনতন্ত্র তৈরী করতে হবে। আর তা করতে হলে, এই পুঁজিবাদ শ্রেণীকে গায়ের জোরে উপড়ে ফেলে দিতে হবে, দখল করতে হবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে, তৈরী করতে হবে নিজেদের গঠনতন্ত্র—যেখানে দেশের উৎপাদন ও বিলি ব্যবস্থার মালিক হবে রাষ্ট্র, লাভ লোকসান হবে রাষ্ট্রের। আর সে রাষ্ট্র মেহনতকারী মানুষেরই স্বার্থ বজায় রাখবে।

আজ তাই গণপরিষদে যত আড়ম্বরেই গঠনতন্ত্র তৈরী হোক না কেন, যত গাল-ভরা কথা দিয়ে তাকে গণতান্ত্রিক বলে, প্রচার করা হোক না কেন, আসলে তা মেহনতকারী জনতার নয়। মেহনতকারী জনতাকে নিজের রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র তৈরী করতে হবে। আর তা সম্ভব একমাত্র বিপ্লবের ভেতর দিয়েই যেহেতু পুঁজিবাদ শ্রেণী স্বেচ্ছায় সুড়সুড় করে তাদের যখের ধন রাষ্ট্রটিকে ছেড়ে দেবে না। তার ভাড়াটে সৈন্য ও পুলিশ দিয়ে, গোলাগুলি নিয়ে রুখে দাঁড়াবে দেশের ভুখা মানুষের বিরুদ্ধে।

আজ একদল নামে সমাজতান্ত্রিক বলছেন যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন নেই। জনসাধারণ পরিষদের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সরকার দখল করলেই সব গোলমাল মিটে যাবে। তাঁদের ধারণা রাষ্ট্র একটা পবিত্র কিছু। কাজেই, তাকে পবিত্রভাবে ব্যবহার করতে পারলেই মানুষের আর কোন অশান্তি থাকবে না। এরা হচ্ছে জয়প্রকাশ মার্কা সমাজতন্ত্রী। এরা ভুলে যায় রাষ্ট্র সমাজের শ্রেণী-সংঘাতের ফলে তৈরী হয়েছে, এবং সে রাষ্ট্রের যে গঠণতন্ত্র তৈরী হয়েছে তাতে থাকে রাষ্ট্র-দখলকারী শ্রেণীর গণতন্ত্র। কাজেই গণতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র দখল করার স্বপ্ন দেখার অর্থই শোষণ মেনে নেওয়া। এই কারণে, একটা শ্রেণীর গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে আর এক শ্রেণীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাইরে থেকে আঘাত হেনে ঐ গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে রাষ্ট্র যন্ত্র দখল করতে হবে। সেটাই হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক পথ—মার্কসবাদী লেনিনবাদী পথ আর এ-পথ ছাড়া আজ মুক্তির অন্য কোন উপায়ই নেই।

গত দু'বছর ধরে এয়ার কণ্ডিশন করা ঘরে সারা ভারতের দামী দামী (?) মাথাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে কোটি কোটি টাকা খরচ করে যে শাসনতন্ত্র তৈরী হল তাতে জনসাধারণকে ভুখা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, মেহনতকারী মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের স্বার্থের জন্যে শাসনতন্ত্র তৈরী করতে যে এত আড়ম্বরের দরকার হয় না তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছে লাল চীন। চীনের মুক্ত ফৌজ চীন জনসাধারণকে মুক্তি দিয়েছে আর মুক্ত জনসাধারণ তাই বিনা আড়ম্বরে, আমেরিকা ইংলণ্ডের দোহাই না পেড়ে কয়েক ঘণ্টায়, মাত্র কয়েক পাতায় নিজেদের শাসনতন্ত্র তৈরী করেছে। ভারতবর্ষের মেহনতী মানুষ যে দিন মুক্ত চীনের মত নিজেদের হাতে নিজেদের শাসনভার নেবে সেদিন মাত্র কয়েক ঘণ্টায় তার শাসনতন্ত্র রচনা করে আজকের এই মহারথীদের তৈরী বিরাট শাসনতন্ত্রকে ময়লা কাগজের সঙ্গে ফেলে দেবে। তারই প্রস্তুতি আজ চাই এবং তাই করে চলেছে সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার।

শোষিত মেহনতকারী জনতার
একমাত্র সাপ্তাহিক
সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের হিন্দি মুখপত্র
হামারা পথ
পড়ুন
কার্য্যালয় ঃ—৪৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৩

মধু ও হুল

(২য় পাতার পর)

বিশ্ব বিদ্যালয়ের পিওনদের দ্বারা বিনা খরচে করিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু এই জবরদস্তি মূলক ব্যবহার এখন কেউই সহ্য করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পিওনরা তাই এ কাজে সম্মত নয়। এই অপরাধে ছজন পিওন একের পর এক চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। সম্প্রতি সপ্তম কোপ পড়েছে গিরিধারী নামে পিওনের ওপর। তার অপরাধ বিনা মাইনেতে অধ্যাপক মশাই এর বাড়ীতে পাচকের কাজ চার বছর ধরে নির্বিবাদে করার পর সম্প্রতি তার স্ত্রী দেশ থেকে কলকাতায় আসায় সে নিজের সংসার পাতার ইচ্ছা অধ্যাপক প্রভুকে সসঙ্কোচে জানায়। কিন্তু অধ্যাপক মশাই রেগেই লাল—এত বড় স্পর্দ্ধা, পেয়দার আবার শ্বশুর বাড়ী? সুতরাং গিরিধারীরও চাকরীটি গেল। শোনা যায় এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ অধ্যাপকটি শুধু পিওনের বেলায় এই কাজ করেন তা নয়; তাঁর মেয়েকে-পড়াবার জন্য Subordinate অধ্যাপকদের রেখেও মাইনে দেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সংস্কার করার জন্য এক কমিশন বসেছে। কমিশন কি এই ব্যাপারগুলোর দিকে একটু নজর দেবে? সম্ভবতঃ সময়ের অভাবের জন্য আর একটি বিশেষ পরিবারের সঙ্গে কমিশনে কাজ কারবার চালাবার দরুণ লক্ষ্য এদিকে পড়বেই না।

* * *

সংবাদে প্রকাশ বোম্বাই এর কোন একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ভারতে প্রস্তুত মাল "Made in England" এই ছাপ লাগিয়ে চালাচ্ছিল বলে তাদের শাস্তি হয়েছে। কংগ্রেসী সরকার অবাক করলে দেখছি। যদি বিলাতী প্ল্যান, জিনিষপত্র ভারতীয় বলে চালাতে আপত্তি না থাকে তাহলে উল্টাটা করলেই বা দোষ কোথায়? দোষত থাকতেই পারে না বরং নেহেরুর মতে আন্তর্জাতিক মৈত্রী দৃঢ়তর হবে। ক্রিপ্‌সের উপদেশ মত ভারতীয় অর্থনীতি চলছে, লণ্ডনের বৈঠকে গৃহিত প্ল্যান ভারতরক্ষা পরিকল্পনা বলে চালাতে আপত্তি নেই এমন কি বিলাতী মরিস মোটর গাড়ীর সব অংশ ভারতবর্ষে শুধু জুড়ে দিতেই নাম হয়ে যায় হিন্দুস্থান মোটর, ভারতবর্ষে প্রস্তুত। এহেন অবস্থায় ভারতবর্ষে তৈরী মাল যদি "বিলাতে প্রস্তুত" বলে চালান হয় তাহলে কি ক্ষতি হয়? তবুত তা বিলাতে বিক্রি করা হচ্ছে না হচ্ছে ভারতবর্ষেই। তবুও তাতে আপত্তি করলে ইঙ্গভারত প্রেম সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে—এই কথাটা জানিয়ে দিলে শাস্তিটা হতনা নিশ্চয়।

চটকল মজদুর প্রতিনিধি সম্মেলন

সংযুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের আহ্বানে চটকল মজুরদের সাড়া

গত ১৩ই নভেম্বর বেলা ৩টায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে কমরেড মৃণালকান্তি বসুর সভাপতিত্বে চটকল মজুরদের প্রতিনিধির এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে কলিকাতা ও সহরতলীর বিভিন্ন চটকলের পাঁচশতের অধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন।

সম্মেলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে জেনারেল মোহন সিং বলেন, মালিক শ্রেণীর ও কংগ্রেসী শাসকবর্গের ঘৃণিত আক্রমণের বিরুদ্ধে, সংযুক্ত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সংগ্রামশীল নেতৃত্বাধীনে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন; ইহাই শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির একমাত্র উপায়। ইহার জন্যই প্রয়োজন সংগ্রামী শৃঙ্খলাবোধের। ইহাই মজুর শ্রেণীকে শোষণ ও অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা করিবে।

মূল দাবীর প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে চটকল মজুর নেতা কমরেড দুর্গা মুখার্জি বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—আই. জে. এম.এ. শ্রমিকবিরোধী। যে নতুন কাজের নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া ট্রাইব্যুনালের রায়ের স্বীকৃত মজুরীর হার ও চাকুরীর তথাকথিত সুবিধাদি হইতে চটকল মজুরদের বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহা মজুর স্বার্থকে কৌশলে গলা টিপিয়া মারিবার এক অপূর্ব্ব ফন্দী। নয়া ব্যবস্থায় কাজ ও পয়সা বাড়াইয়া চটকল মজুরের মাহিনা আরও একধাপ কমাইবার এবং বেকারত্বের ভাতাবন্ধের অভিসন্ধি ইহার মধ্যেই আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কমরেড মুখার্জী দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন মুনাফাখোর আই. জি. এম. এর চেয়ারম্যানকে পশ্চিম বাংলা, বিহার ও ইউ. পির জুট কন্ট্রোলার নিয়োগ করিয়া জাতীয় সরকার শোষক মালিক শ্রেণীর সহিত এক এবং অভিন্ন আত্মার যে পরিচয় দিয়াছেন, সর্ব্বোপরি মুনাফা শীকারী ধনিক মালিকের শোষণের অব্যাহত ক্ষমতা ও মুনাফার পাহাড় গড়িবার যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছে তাহার হাত হইতে চটকল মজুর ও পাটচাষীদের রক্ষা করিতেই হইবে। কমরেড মুখার্জী আই. জে. এম. এর সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ এবং সরকারের মালিক শ্রেণীর পক্ষপাতমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন চটকল মজুরদের বেতনের হার ও আয় কমানো এবং প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, গ্রাচুয়িটি, ছুটী, বেকার ভাতা কমাইয়া বা বাতিল করিয়া দেওয়ার জন্য যে জঘন্য ষড়যন্ত্র আজ চটকল মজুরের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্ব্বিসহ করিয়া তুলিয়াছে, ইহা রোধার জন্য সম্মিলিত আন্দোলনকে তীব্র হইতে তীব্রতর করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। সম্মিলিত আন্দোলনই একদিকে আপোষবাদ দালালী ও উগ্র বিপ্লবীপনা, অন্যদিকে মালিক ও সরকারের আক্রমণের হাত হইতে চটকল মজুরদের সমস্যা মিটাইয়া দাবী প্রতিষ্ঠা সার্থক করিয়া তুলিবে।

মূল ও অন্যান্য প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন কমরেড সুধীন প্রামাণিক, বিশ্বনাথ দুবে, কামাখ্যা গুহ ও আরও অনেকে।

সম্মেলনে কমরেড শিবদাস ঘোষ, শিশির রায়, নিহার মুখার্জী, শঙ্কর ব্রহ্ম, শান্তি দত্ত, শক্তি দত্ত, সুভাষ বসু, বরদা মুকুট মনি প্রভৃতি বিশিষ্ট শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতা উপস্থিত ছিলেন।

(৩য় পাতার পর)

কামীদের বিশ্বজোড়া শিবির গড়ার চেষ্টাকে পরাজিত করা যায়নি।"

চীনের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক কুও-মো-জো ঘোষণা করেছিলেন "আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সংগ্রামকে জয়যুক্ত করতে হলে নেতৃত্ব থাকা চাই সোবিয়েতের হাতে এ কথা চীনা জাতি স্বীকার করে।"

ডিন অব ক্যাণ্টারবেরী ডাঃ হিউলেট জনসন বলেছিলেন :—"সোবিয়েৎ ইউনিয়ন চিরকাল শান্তি চেয়েছে বরাবর শান্তির জন্য চেষ্টা করে এসেছে। সমাজতন্ত্রের অগ্রদূত আপনারা শান্তি সংগ্রামের অগ্রদূত।…"

এ সমস্ত উক্তির মধ্যে দিয়ে কোটি কোটি মানুষের সাধের বাসনাই রূপায়িত স্তালিনীয় শান্তিনীতি ইঙ্গ মার্কিণ যুদ্ধ-দানবদের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সংগঠিত করছে। লেনিন বলেছিলেন :—

"রাজনীতিতে আন্তরিকতা অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে সম্পর্কের স্থাপনের কর্ত্তব্যপালন করতে হবে সেই রাজনীতিতে আন্তরিকতার অর্থ কথা আর কাজের মধ্যে এমন মিল থাকা যা সহজই যাচাই করে নেওয়া যাবে।"

সোবিয়েতের শান্তি নীতিকে পৃথিবীর সাধারণ মেহনতি মানুষ যাচাই করে নিয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে লেনিন স্তালিন যে শান্তিবৃক্ষের বীজ বপন করেছিলেন আজ তা ফুলে ফলে ভরে উঠছে।

শান্তির আদর্শ আজ বিশ্ববাসীর হাতে সে আদর্শ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে। তার জয়লাভ না হয়ে পারে না। —টাস

শুধু লোক বদলালেই চলবে না

রাষ্ট্রযন্ত্র পাল্টাতে হবে

কেদারনাথ জুট মিলের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন কারখানার সহানুভূতি সূচক ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের সভায় কমরেড উৎপল রায়ের বক্তৃতা

গত ৩ মাস যাবৎ কেদারনাথ জুটমিলের শ্রমিকরা তাহাদের বেতন বাড়াইবার দাবীতে ধর্ম্মঘট করিয়া আছে। আই. এন. টি. ইউ. সি নেতা বেরী সাহেব ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সরকারের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী সুনীল ব্যানার্জ্জি দালালী করিয়া কারখানা চালাইতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়। শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট চালাইয়া যাইতেছে। গত ১।১২।৪৯ তারিখে লিলুয়া, বালী, বেলুড়, ঘুষুড়ী, প্রভৃতি যায়গায় বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা কেদারনাথ জুটমিলের ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে ও কংগ্রেসী সরকারের জুলুমের প্রতিবাদে অর্দ্ধদিবস হরতাল পালন করিয়া এক সভা করে। ৩০০০ শ্রমিকের এই সভায় কমরেড নারসিং সিং, কমরেড উৎপল রায় ও আরও অনেকে বক্তৃতা করেন। কমরেড নারসিং সিং তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে শ্রমিকরা যদি তাদের শোষণ ও জুলুম বন্ধ করিতে চান তবে সংগ্রামের পথে নামিয়া আসুন। তিনি বলেন যে ১৫ই আগষ্টের স্বাধীনতা যেহেতু মজদুর, কৃষাণদের কোন সুখ আনিয়া দেয় নাই তাই শ্রমিকদের নিজেদের দাবী পূরণ করিবার জন্য সংগ্রামের অধিকার নিশ্চয়ই আছে। যাহারা জাতীয় সরকারের দোহাই পাড়িয়া শ্রমিকদের সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিতে বলেন তাহারা শ্রমিকের বন্ধু ত ননই বরং শ্রমিকের বিশ্বাসঘাতকতাই এরা করিতেছেন। কমরেড উৎপল রায় বলেন ১৫ই আগষ্টের আজাদী আমাদের কোন অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারে নাই তার কারণ বৃটিশ সরকার শোষণ করবার জন্য যে রাষ্ট্রযন্ত্র গঠন করিয়াছিল সেই রাষ্ট্রযন্ত্রই অটুট রাখিয়া আমাদের দেশীয় লোক উহা চালনা করিলে শোষণ বন্ধ করিতে পারিবে না। যে কেউ উহা চালনা করুক না কেন এই রাষ্ট্রযন্ত্র বজায় থাকিলে শোষণও বজায় থাকিবে। কাজেই যদি শোষণ বন্ধ করিতে হয় তবে শুধু লোক বদলালেই চলবে না, বর্ত্তমানের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া নতুন রাষ্ট্র তৈয়ারী করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন আজ শ্রমিকশ্রেণী শক্তিশালী হইয়াছে, তাহারা শোষণ বন্ধ করিবার জন্য আগাইয়া আসিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া মালিকরা এই শোষণ বজায় রাখার জন্য এক নতুন কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। তাহারা জানে যে একতরফা অত্যাচার চালাইয়া শ্রমিকশ্রেণীকে আজ আর রোখা যাইবে না তাই তারা নিজেদের লোক দিয়াই দালাল ইউনিয়ন গঠন করিয়া শ্রমিকদের ৫।১০ টাকা বেতন বাড়াইয়া দেয় ও শ্রমিকশ্রেণীর যে মূল দাবী শোষণ বন্ধ করার সংগ্রাম হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়া নিজেদের শোষণ অব্যাহত রাখে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য হইল এই মুখোসধারী শ্রমিক দরদী সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। তিনি শ্রমিকদের এই বলিয়া সাবধানে করিয়া দেন যে শ্রমিকরা যদি এই দালালদের রূপ অতি শীঘ্রই চিনিয়া লইতে না পারেন তবে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অতঃপর সভা শেষ হইলে এক বিরাট শোভাযাত্রা কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে।

ট্রাইব্যুনালের বিচারের প্রহসন

ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন ও উহার শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে ট্রাইবুনাল বসিয়াছিল তাহার রায় মজুরদের সন্তুষ্ট করিতে না পারায় মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশঃ অসন্তোষ বাড়িয়া চলিতেছিল। দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনা করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় এবং দিনের পর দিন মালিকের জুলুমের মাত্রা বাড়িয়া চলিলে শ্রমিকরা বাধ্য হইয়া ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে আবার ধর্ম্মঘট করিতে বাধ্য হয়। শান্তিপূর্ণ ও সফলভাবে ধর্ম্মঘট চলিতে থাকিলেও মৌভাণ্ডার মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি ও বিহার প্রাদেশিক জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের নেতা মাইকেল জন মালিকের সহিত গোপন পরামর্শ করিয়া পুলিশের সাহায্যে ধর্ম্মঘট অর্দ্ধপথে থামাইয়া দেয় এবং মজুরদের এই বলিয়া মিথ্যা আশ্বাস দেয় যে, ট্রাইব্যুনাল মারফত তাহাদের দাবী আদায় করিয়া দিবে।

দীর্ঘ পাঁচ মাস অতীত হইবার পর ট্রাইব্যুনালের যে রায় বাহির হইয়াছে তাহা শ্রমিকদিগকে সম্পূর্ণ নিরাশ করিয়াছে; এই রায়ের সহিত ১৯৪৭ সালের রায়ের কোন প্রভেদই নাই। শ্রমিকদের দাবী ছিল—(১) ৩০৲ টাকা মাগগী ভাতা, (২) বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্যের অনুযায়ী বাঁচিবার মত মজুরী, (৩) প্রোডাকশান বোনাস, প্রফিট শেয়ারিং বোনাস প্রভৃতি, (৪) প্রত্যেক মজুরকে কোয়ার্টার দিতে হইবে, (৫) অন্যায়ভাবে বরখাস্ত শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগ, (৬) ধর্ম্মঘট চলাকালীন ছাঁটাই ইউনিয়নের নেতাদের পুনর্নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার পরিবর্ত্তে ট্রাইবুনাল (১) মাগগী ভাতা কিছুই বাড়ায় নাই; শুধু রেশন বাবদ ৫৶০ স্থলে ৬৷৷০ (বিবাহিতদের জন্য) এবং ৩৶০র স্থলে ৪৲ (অবিবাহিতদের জন্য) (২) বাঁচিবার মত মজুরীর বদলে দৈনিক এক আনা হারে মজুরী বৃদ্ধি সুপারিশ করিয়াছে (৩) বোনাস প্রভৃতির ব্যাপারে কিছুই করে নাই (৪) কোয়ার্টার দেওয়া না দেওয়া কোম্পানীর মর্জ্জির উপর ছাড়িয়া দিয়াছে, (৫) ছাঁটাই মজুরদের কেবলমাত্র একজনকে পুনর্নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছে এবং (৬) ছাঁটাই শ্রমিক নেতাদের বিষয় অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য চাপা দিয়াছে।

এইভাবে মোট দাবী দাওয়ার কিছুই মানা হয় নাই। বর্ত্তমান পুঁজিবাদী সরকারের দ্বারা নিযুক্ত ট্রাইব্যুনাল পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। আজ পর্য্যন্ত কোন একটি শালিশীতেও শ্রমিকদের সুবিধা হয় নাই তথাপি এই অত্যন্ত স্বার্থবিরোধী রায় মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হইয়াছে শ্রমিককে আইনের জোরে। সরকার পুঁজিবাদী সরকার, তাহার উপর যদি মজুর ইউনিয়ন গুলি পুঁজিপতি শ্রেণীর দালাল বা প্রচ্ছন্ন দালালদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে শ্রমিকের দাবী কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশন শ্রমিক ভাইদের সেই অবস্থা। তাই তাহাদের এই দুরবস্থা। জন সাহেব আই, এন, টি, ইউ, সির নেতা; আর আই, এন, টি, ইউ, সি, মালিক ও মালিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী ভারত সরকারের শ্রমিক সংঘ। সুতরাং মজুরের স্বার্থ রক্ষা করার প্রকৃত চেষ্টা তাহারা করিতেই পারে না। এই কথা মজুর ভাইরা দীর্ঘ দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝিয়াছে। দাবী আদায় করিতে হইলে সংগ্রাম করিতেই হইবে; সংগ্রাম ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত ভিক্ষা মিলিলেও দাবী কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। জন সাহেব সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতেই দিবে না আর শ্রমিকরা জোর করিয়া ধর্ম্মঘট করিলে পিছন হইতে আঘাত হানিয়া সে ধর্ম্মঘট বানচাল করিয়া দিবে—এইবার যেমন দিয়াছে। শ্রমিক ভাইদের জন সাহেবের মোহ কাটাইয়া, আই, এন, টি, ইউ, সির বাহিরে আসিয়া নিজেদের ইউনিয়নকে জঙ্গী ইউনিয়ন গড়িতে পারিলে তবেই দাবী আদায় হইবে।

বিহারে নভেম্বর বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপন

ঘাটশীলা :—

গত ৭ই নভেম্বর ঘাটশীলায় স্থানীয় ছাত্রদের এক ঘরোয়া বৈঠকে নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড হীরেণ সরকার। কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী নভেম্বর বিপ্লব দিবসের তাৎপর্য্য সভায় ব্যাখ্যা করেন এবং বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছাত্র তথা বৃহত্তর জনসাধারণের কি কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দেন। সভায় কয়েকটি ছাত্রও নভেম্বর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। কমরেড সভাপতি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, কংগ্রেসী নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং বলেন ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কায়েম করিতে হইলে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা গ্রহণ করিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিয়া সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহার প্রস্তুতির সময় এখন; গ্রামে, সহরে, বস্তিতে, গণকমিটি গঠন করিয়া সেই পথেই আগাইতে হইবে। সর্ব্বশেষে সরকারের গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করিয়া এবং ১৪৪ ধারা উঠাইয়া লইবার দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মৌভাণ্ডার :—

গত ৮ই নভেম্বর ইণ্ডিয়ান কপার করপোরেশনের মজুররা নভেম্বর বিপ্লব দিবস পালন করেন। কারখানার মজুর নেতা কমরেড রামেশ্বর প্রসাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কমরেড অমৃতেশ্বর চক্রবর্ত্তী মজুরদের বিপ্লবী ভূমিকা ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে তাঁহাদের দায়িত্বের কথা বলেন। তিনি পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দেন পুঁজিবাদকে টিকাইয়া রাখিয়া দুই চারি টাকা মজুরী বৃদ্ধির মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখিলে দুঃখ দুর কখনই হইবে না। পুঁজিবাদী সমাজে দুই টাকা মজুরী বাড়িলে পাঁচ টাকা খরচ বাড়ে। একমাত্র সমাজতন্ত্রের জন্যেই মজুরের মুক্তি। সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই করিতে হইবে। অতঃপর কমরেড হীরেণ সরকার মজুর আন্দোলনে ফ্যাসিষ্ট শ্রমিক সংঘ আই, এন, টি, ইউ, সির ভূমিকা বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে কমরেড সভাপতি ট্রাইব্যুনালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং শ্রমিকদিগকে দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে উপদেশ দেন। সভায় ১৪৪ ধারা তুলিয়া লইবার দাবী করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিহার সরকারের গণতন্ত্রের নমুনা

গণতন্ত্রবিরোধী কালা কানুনে

ট্রেডইউনিয়ন নেতা ও পার্টি কমরেড গ্রেপ্তার

পাটনা :—

বিহার সরকারের ১৯৪৯ সালের 'বিহার মেণ্টেনেন্স অফ পাবলিক সেফটি অর্ডিন্যান্স' অনুসারে গত ১৬ই অক্টোবর আরা পুলিশ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের কর্মী ও সভ্য এবং আরা কলেজের বিশিষ্ট ছাত্র নেতা কমরেড উমাশঙ্কর প্রসাদকে গ্রেপ্তার করে। বিনা ওয়ারেণ্টে তাঁহার গ্রামের বাড়ী তল্লাসী করা হয় এবং আপত্তিজনক কিছু না পাওয়ায় পুলিশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কমরেড প্রসাদকে জিজ্ঞাসা করে, আপত্তিজনক কাগজপত্র, দলের পুস্তকাদি এবং বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যান্য জিনিষপত্র কোথায়। কমরেড প্রসাদকে আরা সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়। তাঁহার গ্রেপ্তারে আরা জেলার বগুরা থানার জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং গ্রাম কিষাণ পঞ্চায়েৎ (কমরেড প্রসাদ দ্বারা গঠিত) এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করে। গণআন্দোলনের চাপে পড়িয়া অতঃপর বিহার সরকার কিছুদিন পরে তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। কমরেড প্রসাদ বর্ত্তমানে আরাতেই আছেন। এইস্থলে উল্লেখযোগ্য কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সংযুক্ত বামপন্থী ছাত্র সম্মেলনে কমরেড প্রসাদের বিহার হইতে প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল কিন্তু এই গ্রেফতারের জন্য তিনি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন নাই।

বিহার নিরাপত্তা আইনের কবলে

বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা কমরেড প্রীতিশ চন্দ

গত ২২শে নভেম্বর তারিখে ধানবাদ মহকুমা হাকিমের আদালতে সিন্ধ্রি সেণ্ট্রাল পি, ডবলিউ, ডি, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রীতিশ চন্দ, সম্পাদক কমরেড শিশির ঘোষ ও অফিস সম্পাদক কমরেড নৃপেন চক্রবর্ত্তীকে বিহার পাবলিক মেনটেন্যান্স অর্ডারের ৬ ধারা (বে-আইনী শোভাযাত্রা) অনুযায়ী অভিযুক্ত করা হইয়াছে। কমরেড চন্দ আদালতে হাজির না থাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান জারী করা হইয়াছে। অপর দুইজনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্য করার বিষয় কমরেড চন্দ সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের বিহার প্রাদেশিক সংগঠক হিসাবে যখন বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার কাজ বন্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে সরকারী কর্তৃপক্ষ। তাহাতে সফল না হইয়া বিহার নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ।

গরীব চাষীদের উপর নির্য্যাতন

জমিদার ও কংগ্রেসী পুলিশবাহিনীর যুক্ত আক্রমণ

হুগলী জেলায় কৃষকদের চূড়ান্ত দুর্ভোগ

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনে জমিদার জোতদারদের দল গরীব চাষীদের উপর নূতন করিয়া অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে; গত কয়েক বৎসর সরকারী পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর হাতে অসংখ্য চাষীভাই ও চাষী বোনেরা প্রাণ দিয়াছে। রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া চাষীর দল চাষ দিবে আর সেই চাষের ফসল জমিদার জোতদারের গোলায় উঠিবে, এবং চাষী হা, অন্ন হা অন্ন করিয়া ঘুরিয়া মরিবে—এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করার দিন চলিয়া গিয়াছে। চাষী ভাইরা ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিয়াছে পূর্ব্বাপর বৎসরে। প্রতিটি ক্ষেত্রে জমিদার জোতদারের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়াছে কংগ্রেসী সরকার লাঠি, বন্দুক লইয়া; নির্ব্বিচারে চাষীকে হত্যা করিয়া তাহার সারাবৎসরের পরিশ্রমের ফল শোষক জমিদার জোতদারের গোলায় জোর করিয়া তুলিয়া দিয়াছে।

এবারও ধান পাকিতে আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার জোতদার ও সরকারের মিলিত আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে। হুগলী জেলার দক্ষিণডিহী, রাজপুর প্রভৃতি গ্রামের গরীব চাষীরা যে চাষ দিয়াছে তাহার সমস্ত ফসল জমিদার জোতদারের দল পুলিশের সাহায্যে নিজেদের গোলাজাত করার চেষ্টা করিতেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে করিয়াছে। অথচ একবার জমিদার জোতদারের গোলাজাত হওয়ার অর্থ একেবারে হারান। খাজনা, সুদ প্রভৃতি নানা বাবদ তাহার সমস্তই তাহাদের পেটে যাইবে, চাষীর ভাগে কিছুই জুটিবে না।

সংঘবদ্ধ আন্দোলন ব্যতীত এ অবস্থার প্রতিকার হইবে না। অত্যাচারকে বাধা না দিলে তাহা কোনদিনই থামিবে না। আজ জীবনের প্রতিটি ব্যাপারে জুলুম ও নিষ্পেষণ চলিতেছে। মজুর মজুরী চাহিলে মালিক ছাঁটাই করে তাহার প্রতিরোধে দাঁড়াইলে মালিকের পক্ষে সৈন্য ও পুলিশবাহিনী লইয়া উপস্থিত হয় কংগ্রেসী সরকার; চাষী নিজের হাতে বোনা ফসল চাহিলে জমিদার জোতদারদের দল বাধা দেয়, সরকারগুলির মুখে চাষীকে নিস্তব্ধ করিয়া দেয়; মধ্যবিত্তের জীবনেও এই এক দুর্ভোগ। দেশজোড়া আন্দোলন ও তাহার মধ্য দিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করিয়া জনরাষ্ট্র কায়েম করিতে পারিলে তবেই এই দুরবস্থা হইতে মুক্তি মিলিবে। সেই উদ্দেশ্যে চাষীভাইদের উচিত গ্রামে গ্রামে সংযুক্ত কিষাণ সভা গঠন করিয়া তাহার নেতৃত্বে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করা, জমিদারী, জোতদারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

সরকারের বাস্তুহারা-দরদ

৭৫টি পরিবারকে গৃহচ্যুত করিয়া পথে নিক্ষেপ

গত সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাঁদমারী বাস্তুহারা শিবির হইতে ৭৫টি পরিবারকে পুনর্ব্বসতির আশ্বাস দিয়া রাণাঘাট থানার অন্তর্গত আজুলিয়া ইউনিয়নের নন্দীঘাট গ্রামে ফেলিয়া আসিয়াছে। দীর্ঘ তিন মাস অতীত হইয়া গিয়াছে অথচ আজ পর্য্যন্ত সরকার বাহাদুরের তাহাদের কথা চিন্তা করিবারও এতটুকু সময় হয় নাই। তাই আজও ৭৫টি পরিবার ৪৫টি ছোট তাঁবুর মধ্যে শীতে ও অনাহারে ভুগিতে বাধ্য হইতেছে। যাহারা প্রাসাদে বাস করে, লক্ষ লক্ষ টাকা নানা ফিকির ফন্দিতে উপায় করে সেই কংগ্রেসী মন্ত্রীরা শীত ও অনাহারের কষ্ট কল্পনা করিবে কেমন করিয়া? শুধু তাহাই নয় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকার এক বহুল প্রচারিত বিরাট প্রেস নোটে জানাইয়াছেন, তাহারা বাস্তুহারাদের কোন দায়িত্ব লইতে পারিবে না। এই কথা বলার সাথে সাথে জানান হইয়াছে কি প্রচণ্ড চেষ্টাই না করিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসী সরকার বাস্তুহারাদের উপকারের জন্য। কাগজপত্রে যত সুন্দর কথা বলা হউক না কেন বাস্তবে বাস্তুহারারা মন্ত্রীদের চোখে ভিক্ষুক ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাই তাঁহারা বাস্তুহারাদের প্রতি এই ধরণের জঘন্য ব্যবহার করিতে পারে।

পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য যাহারা দেশ বিভক্ত করিল তাহারা বাস্তুহারাদের প্রকৃত মঙ্গল চাহে না, এ কথা ভাল ভাবে বুঝিবার দিন আসিয়াছে। যতদিন না জনরাষ্ট্র কায়েম হইতেছে ততদিন এই অবস্থার প্রতিকার নাই। তাই বাস্তুহারাদের মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার একমাত্র শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী সংগ্রামের সফলতার উপরই নির্ভর করিতেছে। সেই সংগ্রামের পরিপূরক হিসাবে বাস্তুহারাদের সংগ্রাম সংগঠিত করিতে হইবে।

পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টের

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের প্রস্তুতি

সারা ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ষ্ট্রাইক-ব্যালট গ্রহণ

পে কমিশনের মঞ্জুরীকৃত বাকী বকেয়া, ন্যায্য মজুরী, ছুটী, বে-আইনী ছাঁটাই বন্ধ প্রভৃতি দাবী লইয়া পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল শ্রমিকদের সহিত কর্তৃপক্ষের কমপক্ষে ৫৩ বার আলাপ আলোচনা চলে। প্রত্যেক বারই শ্রমিকভাইরা সম্মানজনক আপোষ মীমাংসায় রাজী থাকিলেও পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্তৃপক্ষ (১) পে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ন্যায্য মাহিনা হইতে শ্রমিকগণকে বঞ্চিত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প (২) আলীপুর কারখানায় কাজের অর্ডার কমাইয়া দিয়া শ্রমিক ছাঁটাই করিতে বদ্ধপরিকর বলিয়া কোন মীমাংসা হওয়া সম্ভব হয় নাই। শুধু তাহাই নয় ইতিমধ্যে টেলিগ্রাফ ষ্টোরের ২৩৪ জন শ্রমিকের উপর ছাঁটাই এর নোটীশ জারী হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৩০ জনের চাকুরী ৩০শে নভেম্বর এবং বাকী ১০৪ জনের ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত থাকিবে।

এই সমস্ত বিষয়ের প্রতিবাদে এবং তাহাদের দাবী আদায়ের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রের পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল শ্রমিকরা ধর্ম্মঘটের জন্য সংঘবদ্ধ হইতেছেন; বহু স্থানেই ষ্ট্রাইক ব্যালট গ্রহণ শেষ হইয়াছে। শ্রমিকরা যাহাতে সংঘবদ্ধ হইতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ দালাল নিয়োগ করিয়াছে বিভেদ সৃষ্টি করিবার কাজে। একদিকে এই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা অন্যদিকে শ্রমিকদিগকে দাঙ্গাহাঙ্গামায় প্ররোচিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কর্তৃপক্ষের একজন দালাল "কারপেন্টার সপের" মধ্যে এক শ্রমিক ভাইকে অহেতুক গালিগালাজ ও নির্ম্মম প্রহার করিয়াছে। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রমিককে উত্তেজিত করাও ইহার পাল্টা জবাব হিসাবে মারপিটের পথ লইতে প্ররোচিত করিয়া ধর্ম্মঘট সহজেই বানচাল করিয়া দেওয়া।

দাবী আদায় করিতে হইলে শ্রমিক ভাইদের সর্ব্বাগ্রে দরকার ঐক্যবদ্ধতা। আজই সর্ব্বসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে ষ্ট্রাইক কমিটি গঠন করুন, ষ্ট্রাইক কমিটির অধীনে শ্রমিকদের মধ্যে সংগ্রামী মনোভাব, ঐক্যবদ্ধতা, গড়িয়া তুলুন, সভা করিয়া। প্রত্যেকটি শ্রমিক ভাইকে বুঝিয়া লইতে দিন—কেন এই সংগ্রামে নামা হইয়াছে, কি করিলে সংগ্রামে সফল হওয়া যাইবে, ইহার শত্রু কাহারা।

সর্ব্বশেষে ঘরশত্রু বিভীষণ সম্বন্ধে সজাগ থাকুন। পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের বড় কর্ত্তারাই একমাত্র শত্রু নয়; শত্রু ঘরের মধ্যেও লুকাইয়া আছে। বড় কর্ত্তারা শত্রু বটেই কিন্তু যেহেতু তাহারা জানা শত্রু সেই হেতু তাহাদের সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে পারা যায় যাহাতে তাহারা ক্ষতি করিতে না পারে। কিন্তু ইহারা ছাড়াও ঘরশত্রু দালালরা আছে। তাহারা লড়াই-এর আগে গরম গরম বুলি বলে, সংগ্রামে নামার ভাব দেখায় কিন্তু ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইলেই কিংবা হইবার ঠিক আগে মালিক পক্ষে যোগ দিয়া ধর্ম্মঘট ব্যর্থ করিয়া দেয়। ইহারা সামনা সামনি আক্রমণ না করিয়া পিছন হইতে ছুরি মারে। জানা শত্রু অপেক্ষা অজানা শত্রুরাই বেশী সাংঘাতিক। তাই ইহাদের সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক থাকিতে হইবে। দেখিতে হইবে ষ্ট্রাইক কমিটিতে এই ধরণের কোন ব্যক্তির যেন স্থান না হয়, এইরূপ কোন লোক নেতাদের মধ্যে থাকিলে তাহাকে জানামাত্রই সরাইয়া দিতে হইবে। অনেক দিন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতা আছে কিংবা শিক্ষিত, ভাল বক্তা—এই সমস্ত কোন কিছুই গ্রাহ্য করিলে চলিবে না। নেতাদের মধ্যে মালিকের দালাল থাকিলে শ্রমিকের লড়াই সফল হইতেই পারে না। রেল শ্রমিক, পোষ্টাল কর্ম্মচারী প্রভৃতিদের বেলায় ইতিহাসের শিক্ষা হইল তাহাই। এইবার আগের ভুল করিব না—ইহাই হইবে নীতি।

৩০ জনের ফাঁসি

(১ম পাতার পর)

জন কৃষককর্ম্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, দীন সিঙ্গইয়া নামে একটি ১১ বৎসর বয়স্ক বালককে ৪৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে; ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আরও ৩০ জন কৃষকনেতার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইহা সাম্প্রতিক আদেশ; ইহার পূর্ব্বে এইরূপ নির্য্যাতন আরও হইয়াছে।

হিটলার মুসোলিনীর আমলে জার্মানী ও ইতালীতে, ফ্রাঙ্কোর স্পেনে এবং বর্ত্তমানে গ্রিসে এই ধরণের অমানুষিক পৈশাচিকতার প্রমাণ মেলে। ভারতবর্ষে যে ফ্যাসিষ্টরাজ কায়েম হইয়াছে তাহা এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের হাত হইতে বাঁচিতে হইলে শ্রমজীবি মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়িতে হইবে। এই সংগ্রামী ঐক্যের সফলতাই ভারতবর্ষে এই ধরণের ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারকে রুদ্ধ করিতে পারে।

জয়প্রকাশের ধাপ্পা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভার প্রারম্ভে সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা **রামনন্দন** মিশ্র বলেন—"১৯২৭ সালে **চীনের কৃষকদের** long route march এর পর সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে বিহারের **কৃষকদের** এই সভা ও প্রদর্শন অন্যতম **প্রধান** ঐতিহাসিক বিশিষ্ট ঘটনা।" ইহার পর **নানা** বাগাড়ম্বরের পর মিশ্রজী—"**কৃষকরা** তাহাদের অন্তরের কথা কংগ্রেসী **মন্ত্রীদের** শুনাইবার জন্য আসিয়াছে। **সেই কারণে** বিহারের অন্যতম মন্ত্রী জগৎ**লাল** চৌধুরী সমাবেশে উপস্থিত হইয়াছেন **জয়প্রকাশের** অনুরোধ প্রধান মন্ত্রী **শ্রীকৃষ্ণ** সিংহের নিকট উপস্থিত করিতে"**—এই কথা** বলিয়া বক্তৃতা শেষ করেন। **কিছু** হাততালি পড়ে কিন্তু প্রায় সমস্ত **চাষী জমি** পাইবার আশায় আসিয়া **কি শুনিল** এই ভাবিয়া ফ্যালফ্যাল চোখে **তাকাইয়া** থাকে, নিরাশায় তাহাদের **হাততালি** দিবার মানসিক অবস্থা ছিল না।

আরও বক্তা উঠিলেন বসিলেন; **তারপর** দাঁড়াইলেন 'ভারতের লেনিন' **জয়প্রকাশ**। ঠিক যেন কংগ্রেসী জওহর**লাল—**সেই একই কায়দা, বিনয়ের নামে **আত্মম্ভরিতা**; তারপরে যাবতীয় ঢঙে অভিনয়। তাঁহার দেড় ঘণ্টা বক্তৃতার সার **মর্ম** দাঁড়ায়—কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আজ **পেশা দাঁড়াইয়াছে** চোরাকারবারী, ঘুষখোরী, **ব্যাভিচার** ইত্যাদি; তাই যতদিন **তাহারা** মন্ত্রী থাকিবে ততদিন ভাল হইবে না। জনতা যদি বাঁচিতে চায় **তাহা হইলে** তাহারা যেন সোস্যালিষ্ট **পার্টির** প্রতিনিধিদের পরিষদ গৃহে পাঠায়। **তাহারা** একবার **মন্ত্রী** হইতে পারিলেই **দুঃখ দূর** হইয়া যাইবে। ইহার পরই **তিনি** পণ্ডিত নেহেরুকে সোস্যালিষ্ট **পার্টিতে** যোগ দিতে আহ্বান করেন। **সকলে** মিলিয়া যদি ইংলণ্ডের এটলির লেবার দলের মত দল গঠন করা যায় **তাহা হইলে** সমাজতন্ত্র কায়েম হইবে। **ইহা হইল** তাঁহার মত।

চাষীদের মধ্যে দুই একজনকে প্রশ্ন **করিতে** দেখা যায়—জমিদারী প্রথার **কি হইল**, জমি কি মিলিবে? বাজ লাগান স্বেচ্ছাসেবক দল তাহাদিগকে থামাইয়া **দিল**। কিন্তু 'ভারতের লেনিন' সাধারণ **চাষীর** দ্বারা বক্তৃতায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়া **একটু** গরম হইলেন বোধ হইল। তাই **উত্তর** হইল "সোস্যালিষ্ট পার্টি ক্ষমতা **পাইলে** তবে জমি মিলিবে; কৃষকরা আগে আমাদের ভোট দাও তবে ত জমির কথা।" তারপর চলিল সমাজতন্ত্রের নয়া নয়া **ভাষ্য—**চাষীদের দুঃখ কষ্টের অধিকাংশই **তাহাদের** সৃষ্টি, নিজেরা চেষ্টা করিলে তাহাদের দুঃখ তাহারাই দূর করিতে পারে। গ্রামের খাল, বিল, **পরিষ্কার করিয়া** জলসেচের **ভাল ব্যবস্থা করিলে** ফসল ভাল **হইবে, চাষীদেরও উন্নতি** হইবে। **তাহা না করিয়া শুধু সরকারের** দোষ দিলে চলিবে কেন?

গরীব চাষীর দল ইহার পর কি করিবে? একদিনের পথশ্রমে ক্লান্ত চাষীরা অভিজাত সমাজতন্ত্রী বাবুদের কথা শুনিয়া বুঝিল না কংগ্রেসী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশের প্রভেদ কোথায়।

ইন্দ্রনগর কেবল ফ্যাক্টরীতে ২॥ মাস ধর্ম্মঘট

দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী বলদেব সিং-এর মালিকের সহিত সহযোগিতা

(নিজস্ব সংবাদদাতা।)

জামসেদপুর

জামসেদপুরের ইন্দ্রনগরে ভারতের ডিফেন্স মিনিষ্টার সর্দার বলদেব সিংএর পিতা ইন্দর সিংএর Cable Factoryতে ৪৫ দিন ধরিয়া সফল ধর্মঘট চলিতেছে। শ্রমিকরা বোনাস, বেতনবৃদ্ধি, কোয়ার্টার প্রভৃতি বুনিয়াদী দাবী লইয়া কর্তৃপক্ষের সাথে বহু আলাপ আলোচনা চালায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাহাদের দাবীর কণামাত্র মিটাইবার আগ্রহ প্রকাশ না করায় তাহারা বাধ্য হইয়া ধর্মঘটে নামে। তাহারা আই. এন. টি ইউ. সি ও তাহার নেতা মাইকেল জনের মালিকের **হইয়া** নির্লজ্জ **দালালী** দেখিয়া জাতীয় **টি. ইউ. সি** সম্বন্ধে পরিষ্কার **ধারণা করিয়াছে**। কিছু সংখ্যক শ্রমিকের **সমর্থন পাইয়া** জয়প্রকাশী সোস্যালিষ্ট নেতা **মুন্সী** আহমদ দীন আংশিকভাবে ধর্ম্মঘটে **নেতৃত্ব** দিতেছেন। কিন্তু তিনিও **সোস্যালিষ্ট** পার্টির চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মালিকের সহিত যে কোন মুহূর্ত্তে আপোষ **করিয়া** ধর্মঘট বানচাল করিয়া দিতে পারেন—এই ভয় মজুরদের মধ্যে যথেষ্ট **দেখা** দিয়াছে।

১৪ই নভেম্বর তারিখে **সোস্যালিষ্ট** ইউনিটি সেণ্টারের **বিহার প্রাদেশিক** সংগঠক কমরেড প্রীতিশ চন্দ **জামসেদপুর** আসিলে **তাঁহার সহিত বহু ধর্মঘটী** শ্রমিকের **আলাপ** আলোচনা **হয়**। **কমরেড** চন্দের সাথে মৌভাণ্ডার মজদুর নেতা কমরেড **হীরেন** সরকার**ও ছিলেন**। এক ঘরোয়া বৈঠকে কমরেড **চন্দ ও** সরকার **ধর্মঘটীদের** দৃঢ়ভাবে **ধর্মঘট চালাইয়া** যাইতে বলেন **এবং বিশেষ করিয়া জয়প্রকাশী** সোস্যালিষ্ট নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার হাত হইতে **সাবধান** থাকিবার জন্য জঙ্গী ধর্মঘট **কমিটি বানাইতে** বলেন। **কমরেড চন্দ আরও বলেন মন্ত্রীত্বলোভীরা** রাজনৈতিক **জনপ্রিয়তা** অর্জনের জন্য **ধর্মঘটের কথা বলে এবং** বিপদ বুঝিলেই পালাইয়া যায়; **কিন্তু** ভুখা শ্রমিক রুটির জন্য **লড়াই করে**। সুতরাং এই লড়াইয়ে জিতিতে **হইলে** নিজেদের সংগঠন মজবুত করিতে **হইবে**, বিপ্লবী কমিটী গড়িতে হইবে **এবং বিপ্লবী** কায়দায় লড়িতে হইবে। **ধর্মঘটীদের** সোস্যালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টারের **তরফ** হইতে পূর্ণ সমর্থন জানান **হয়**।

শোনা যায় এই **ধর্মঘটের জন্য মন্ত্রী** বলদেব সিং দুইবার জামসেদপুরে **আসেন**। তিনি তাঁহার পিতার সহিত সম্পূর্ণ একমত—ছয় মাস ধর্মঘট চলিলেও শ্রমিকের দাবী মেটানো **হইবে না**। আসল ব্যাপার হইতেছে, পুত্রের **সাহায্যে** ভারত সরকারের সহিত ব্যবসায় **সংক্রান্ত** কোন একটি লেন দেনের ব্যাপারে **এই** কারখানা আশাতীত মুনাফা **লুটিয়াছে** তাই তাহারা ধর্মঘটে ভীত **নয়। ঐ লাভেই** বহুদিন চলিয়া যাইবে।

দীন সাহেবের মত নেতাদের **মতি**গতিও সন্দেহজনক। **জয়প্রকাশ নারায়ণ** পাকাপোক্ত এডজুডিকেশন **কিংবা ট্রাইবুনালের** জন্য ওকালতি আরম্ভ **করিয়া** দিয়াছেন; দুই একবার বলদেব **সিংএর** মাধ্যমে আলাপ আলোচনাও চলিয়াছে।

প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশন

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় শিল্পকলা দাঁড়িয়েছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের খেয়ালের সামগ্রী; ফলে সংস্কৃতি ও শিল্পকলা চর্চার নামে চলছে যত মিথ্যার বেসাতি, পচা গলিত চিন্তাধারার রোমন্থন, বিকারগ্রস্থ মনের যৌন প্রলাপ, এককথায় মানসিক পতিতাবৃত্তি। বুর্জোয়া সমাজের কাছে শিল্পকলা হল প্রয়োজনাতিরিক্ত। দেহের খোরাকের অভাবে যে সমাজে জনতা মুমূর্ষু, মনের খোরাক সে সমাজে খোরাক বলেই স্বীকৃত হতে পারে না। তাই আজ কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনে শিল্পকলা সংস্কৃতির কোন স্থান নেই।

ধনিকের ঘরের চিলের কোঠায় যে শিল্প বাঁধা পড়ে আছে তাকে সে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনে জনজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। জনতার জীবনের কথা, তার জীবনসংগ্রামের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করে এনে জাতির সামনে তুলে ধরতে হবে, তাকে বিপ্লবী শক্তি হিসাবে গড়ে তুলবার কাজে। এই কাজে শিল্প সংস্কৃতির দান অসামান্য। মহাচীনের ও সোবিয়েত বিপ্লবের ইতিহাস তার জলন্ত প্রমাণ। ভারতবর্ষেও সেই আদর্শ গড়ে তুলতে হবে জনকৃষ্টিসংঘ।

প্রগ্রেসিভ কালচারাল এসোসিয়েশন সে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে দেখে নতুন আশার আলো দেখি। আশা করি তাঁরা ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতির কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে তাঁদের ওপর ন্যস্ত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবেন।

কমরেডদের সাফল্য কামনা করি, সর্ব্বতোভাবে এঁদের বিপ্লবী প্রচেষ্টায় সহযোগিতার হাত বাড়াই, এঁদের বিপ্লবী অভিনন্দন দি—সম্পাদক, গণদাবী।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ
আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির নির্ভুল বিশ্লেষণ
মানুষের মত বাঁচার পথ
জানিতে হইলে
সোভিয়েট ল্যাণ্ড
পড়ুন
অনুসন্ধান করুন :—টাস নিউজ এজেন্সি, ৬, ক্যানিং রোড, নয়াদিল্লী

সম্পাদক প্রীতিশ চন্দ কর্তৃক পারাবেষক প্রেস, ২৩ ডিক্সন লেন হইতে মুদ্রিত ও ৪৮ ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা ১৩ হইতে—প্রকাশিত